Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 160 – 165
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কিন্নর রায়ের নির্বাচিত গল্প : বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি

ঈশিতা সিন্‌হা
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : sihita9995@gmail.com

Keyword
কিন্নর রায়, ভোজ, হরিজন, পরচারক, বাবাজী, মরুমায়া, বেকারত্ব, দলমত, গ্রামদখল, হাওয়া ফিস ফিস।

Abstract
কথা সাহিত্যিক কিন্নর রায় ব্যক্তিজীবনে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। নকশাল আন্দোলন বিরুদ্ধে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হলে, প্রশাসন কর্তৃক তিনি বেশ কয়েকবছর কারাবাসও করেছেন। কারাবাস থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি প্রত্যক্ষভাবে পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক লেখালেখি করেছেন। তিনি রাজনৈতিক পালাবদল, সংগঠনের রীতি-নীতি, সশস্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন। আর এইসবকিছুই তিনি প্রকাশ করেছেন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাঁর রচনায় উঠে এসেছে নকশাল বাড়ির আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, জরুরী অবস্থা জারি প্রভৃতির কথা। শুধু তা-ই নয়, পরিবেশ-প্রকৃতিও তাঁর সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। কিন্নর রায়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করবার মতো আরো একটি বিষয় হল সমাজে রাজনীতির প্রভাব। সমাজে উচ্চ-নীচ মনোভাব, মূর্তিপূজা, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, বেকার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলি কীভাবে রাজনীতির শিকার হয়েছে, সেই বাস্তব প্রতিচ্ছবিকে সুনিপুণভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে আমরা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি বিষয়টি পর্যালোচনা করবো।

কিন্নর রায় রচিত বিংশ শতাব্দীর গল্পগুলিতে আমরা বারবার পেয়েছি রাজনীতির কবলে পড়ে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ কীভাবে চরমে উঠেছে সেই প্রতিচ্ছবি। 'ভোজ' গল্পটি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সমাজের রাজনৈতিক বল সম্পন্ন উঁচু সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ কীভাবে প্রশাসনকে গ্রাস করে, তারা মন্দির স্থাপন করতে বিপুল টাকা ব্যয় করে অথচ সমাজে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের মরতে হয় অনাহারে। সময়ের সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সমাজও একইভাবে বদলেছে। স্বাভাবিকভাবে কিন্নর রায়ের রচনার বিষয়বস্তুও বদলেছে। বর্তমান সমাজে চোখে পড়ার মতো সমস্যা হল - বেকার সমস্যা ও হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। কাজের খোঁজে কীভাবে বাড়ির সন্তানরা বাইরে যাচ্ছে, কীভাবে ধর্মের গোঁড়ামি বর্তমান সমাজকে মানুষের কাছে মরুভূমি করে তুলছে তার প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়েছি 'মরুমায়া' গল্পে। এছাড়াও রয়েছে 'পর্‌চারক' সহ অন্যান্য গল্প যেখানে আমরা পেয়েছি সমাজ-রাজনীতির নানা দিক। কিন্নর রায় কীভাবে রাজনৈতিক

বাস্তবতার কথা বলছেন এবং সাম্প্রতিক সমাজ ও সাহিত্যে কীভাবে তার প্রভাব পড়ছে সেই প্রসঙ্গগুলি আমরা মূল প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

Discussion

কথা সাহিত্যিক কিন্নর রায় ব্যক্তিজীবনে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। সরকার দ্বারা সেই আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলে, প্রশাসন কর্তৃক তিনি দীর্ঘদিন কারাবাসও করেছেন। কারাবাস থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি প্রত্যক্ষভাবে পার্টির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনীতি বিষয়ক লেখালেখি করেছেন। তিনি রাজনৈতিক পালাবদল, সংগঠনের রীতি-নীতি, সশস্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন। আর এই সবকিছুই তিনি প্রকাশ করেছেন সাহিত্যসৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তাঁর 'কাছেই নরক', 'মৃত্যু কুসুম', 'ব্রহ্মকমল', 'রেড করিডরের জানালা', 'পতনের পর' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিভিন্ন রচনায় উঠে এসেছে নকশালবাড়ি আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, জরুরী অবস্থা জারি প্রভৃতি বিষয়গুলি। শুধু তা-ই নয়, পরিবেশ-প্রকৃতিও তাঁর সাহিত্যে উজ্জ্বলভাবে ধরা পড়েছে। কিন্নর রায়ের সাহিত্যে লক্ষ্য করবার মতো আরো একটি বিষয় হল 'সমাজ', যা রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়েও, বলা বাহুল্য আজ পর্যন্ত জাতিগত বিদ্বেষ, উচ্চ-নীচ মনোভাব, হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, বেকারত্ব প্রভৃতি সমস্যায় আমাদের সমাজ জর্জরিত। কীভাবে সাধারণ মানুষ এই সমস্যার কবলে পড়ে রাজনীতির শিকার হয়েছে, সেই বাস্তব প্রতিচ্ছবিকে সুনিপুণভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নির্বাচিত গল্প অবলম্বনে আমরা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর রাজনীতির যে প্রতিফলন ঘটেছে সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করবো। আলোচনার সুবিধার্থে এবং আমার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে আমি 'ভোজ', 'পরচারক', 'মরুমায়া', 'দলমত' ও 'হাওয়া ফিস ফিস' এই পাঁচটি গল্পকে বেছে নিয়েছি।

গল্পকার কিন্নর রায় 'ভোজ' গল্পে সমাজ-রাজনীতির এক কঠোর বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। আমরা 'ভোজ' বলতে সাধারণত বুঝে থাকি বিশেষ কোনো কারণে, যেমন- বিবাহ, অন্নপ্রাশন অথবা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বিপুল খাদ্যের আয়োজন। এখানে 'ভোজ' শব্দটি ব্যঞ্জনাস্বরূপ। গল্পকার এই ছোট ঘটনার মধ্যেই তুলে ধরেছেন সমাজের নগ্ন দিকটিকে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে এই আয়োজনে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে আপ্যায়িত। কিন্তু না। গল্পকার খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজের উচ্চবিত্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এবং নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের মধ্যেকার ব্যবধানটিকে। দেখিয়েছেন কীভাবে দিনের পর দিন নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষেরা শোষিত ও অবিচারের শিকার হয়ে আসছে সেই চিত্রটিকে। গল্পের আলোচনায় আমরা তা দেখে নেব।

গল্পে নিম্নবিত্তদের মধ্যে চামারটোলির মোতি চামারের পরিবারের কথা পাওয়া যায়। অন্যদিকে উচ্চবিত্ত জমিদার সম্পদায় হল ধনিকলাল মিশ্র-র পরিবার। ধনিকলালের মা মারা যাওয়ার কারণে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে এক বিশাল 'ভোজ'-এর আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে নিমন্ত্রিত ছিল বামুন, কায়েত ইত্যাদি সমাজের উচ্চবিত্তরা। নিম্মবিত্তরা যে এই ভোজে ডাক পাইনি তা নয়। তবে তারা নিমন্ত্রণ পাইনি। এ প্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন –

> "অচ্ছুতিয়াদের বেলায় সে বালাই নেই। টোলির বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে ডেকে নাও সরপঞ্চ বা মুখিয়াকে। তারপর তাকেই বলে দেয় – তোরা যাবি, ফলানা দিন ফলানা বাবুর বাড়ি ভোজ। হরিজন, গরিব-দুঃখী মানুষ তাতেই বর্তে যায়।"[১]

এই অংশে সমাজের কুৎসিত ভেদাভেদের জায়গাটি স্পষ্ট হয়েছে।

গল্পে আমরা দেখেছি ধনিকলালের দুই ছেলে পরশুরাম আর রামলক্ষ্মণ এই সাধারণ মানুষগুলির টোলাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আবার এও দেখেছি মোতিরামের বড় ছেলে জীবনরাম ধনিকলালের ছেলের গুলিতে মারা যায়। তবুও তারা প্রতিবাদ করতে অক্ষম শুধুমাত্র ক্ষমতার অভাবে। তাই নিজেদের রাগ, দুঃখ সামলে শুধুমাত্র পেটের জ্বালা

মেটাতে সেই ধনিকলালের বাড়িতেই তারা খেতে যায়। এই অংশে সমাজের প্রভাবশালী মানুষের সাধারণ মানুষের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহার দেখানোর দৃশ্যটি স্পষ্ট।

> "তবে ভুখা হাভাতে হরিজন মেয়ের ইজ্জত লুটলে এসব কিছুই হয় না। তাতে পৌরুষ বাঁচে। এম এল এ হওয়ার টিকিট পাওয়া যায়।"[২]

গল্পকারের এই মন্তব্যে সমাজের সাধারণ মানুষের ওপর রাজনৈতিক শোষণের ছবিটি স্পষ্ট। সমাজ রক্ষার দায়িত্ব প্রশাসনের অথচ প্রশাসন যেন রাজনৈতিক দলের কেনা। গল্প পড়ে জানা যায়, লোকাল এম এল এ আসলে ধনিকলালের আত্মীয়। এবং দেখা যায় থানার দারোগা সপ্তাহে একদিন ধনিকের বাড়িতে মদ্যপান করে ও বে-আইনি বন্দুক বাবদ তোলা নেয়। অর্থাৎ ধনিকের হাতের মুঠোয় রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন। তাই সাধারণ মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঠিক বিচার পায় না। তাই গল্পে জীবনরাম গুলি খেয়ে মরলে তার সুবিচার হয় নি। থানায় করা ডাইরি লোপাট হয়ে গেছে। গল্পকার উল্লেখ করেছেন –

> "এফ আই আর-এর পাতা যত্ন করে কাটা হয় কাঁচি দিয়ে। স্থানীয় সি পি আই নেতা এটা নিতে একটু হামতাম করেই কোন অজ্ঞাত কারণে চুপ মেরে যায়।"[৩]

অর্থাৎ দেখা যায় দলাদলির কারণে সাধারণ মানুষের পাশে কেউ সহায় হয় নি।

গল্প শেষে আমরা দেখতে পাই নিম্নশ্রেণির মানুষদের এক নির্মম দৃশ্য। তারা যখন খেতে বসে তখন সূর্য অস্ত গেছে। ধনিলাল তখন ঘোষণা করে যে যত খেতে পারবে তাকে তত বেশি টাকা দেওয়া দেওয়া হবে। এই ঘোষনায় সাধারণ সরল মানুষ সারাদিন উপোসি পেটে শুধুমাত্র পয়সার লোভে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলে। ফলে অনেকের মৃত্যু হয়। একইভাবে মোতিও মারা যায়। এরপর ভোরবেলা ধনিকলাল যখন শোনে তার বাড়িতে খেয়ে যাওয়ার পর তিনজন চামার ও একটি দোসাদ মারা গেছে তখন তার মুখে বিষাদ ফুটে ওঠে। কারণ তার মনে পড়ে ঠাকুমার শ্রাদ্ধে খেতে খেতে প্রায় এগারোজন পাতের ওপরই বমি করতে করতে মারা গিয়েছিল। অর্থাৎ মাত্র চারজনের মৃত্যু যেন তার কাছে অত্যন্ত অসম্মানের। গল্পকার বলেছেন –

> "সেখানে আট গামমা ভোজে মাত্র চারজনের মৃত্যু তার ইজ্জতের মোচটিকে সামান্য নামিয়ে দেয়।"[৪]

অন্যদিকে দেখা যায় হনুমান মন্দির উদ্বোধনের প্রসঙ্গ। মন্দির উদ্বোধন করতে এসেছে উপমন্ত্রী ও এম পি। এপ্রসঙ্গে আমরা পেয়েছি হিন্দুধর্ম রক্ষাকারী মিশনের গুরুকে লাড্ডু দিয়ে ওজনের কথা। এপ্রসঙ্গে গল্পকারের মন্তব্য –

> "অচ্ছুতিয়া মানুষেরা জাতীয় সংহতি, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি ভারী ভারী শব্দ বোঝেনা। দূর থেকে তারা এসব তামাশা দেখে। নাক উঁচু করে জানোয়ারের ঢঙে বাতাসে ভেসে বেড়ানো সুখাদ্যের ঘ্রাণ নেয়।"[৫]

দেখা যাচ্ছে সমাজের একদল প্রান্তিক মানুষ তারা দুমুঠো খেতে পাওয়ার জন্য নিজেদের জীবনকে বাজি রাখে। আর যারা সমাজের কেন্দ্রে থেকে সমাজ পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করে, সেইসব রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিজেদের প্রভাবশালী রূপে ব্যক্ত করার জন্য বিভিন্ন অনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে চলেছে। গল্পটি বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হলেও এই ঘটনা আজও প্রাসঙ্গিক। আজও পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাজ সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমাজকে গ্রাস করছে। বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি পড়া সাধারণ মানুষ দিনের পর দিন প্রতিবাদ করলেও তার কোনো প্রতিকার পায় না। আজও রাস্তাঘাটে, ফুটপাতে দুমুঠো খেতে পাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের হাহাকার ধ্বনি শোনা যায়।

'পরচারক' (১৯৮৬) গল্পে আমরা দেখতে পাই কীভাবে রাজনৈতিক দল ভোটের সময় সাধারণ নিম্নবিত্তদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, অথচ তারা সারাবছর দুবেলা দুমুঠো অন্নের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। গল্পের প্রধান চরিত্র লকিরাম জাতিতে চামার সম্প্রদায়। সে জীবন কাটায় হরিজন সেবাশ্রম-এর টিনের ছায়ায়। বাবাজি (নেতা) এখানে

কখনো দেখতেও আসে না কীভাবে লকিরাম জীবনযাপন করে। কিন্তু সে ভালো গান বাঁধতে পারে বলে তাকে ভোট প্রচারের জন্য নিয়ে যায়। যার উপস্থিতি ছাড়া বাবাজির ভোটে জয়ী হওয়া অসম্ভব সেই রাজাসাহেবের বাড়িতে নির্বাচনের কথা বলতে লাকিরাম ও অন্যান্য হরিজন সেবাশ্রমের মানুষরা যখন যায়, রাজাসাহেব তাদের সম্মান করে 'সোফা'য় বসতে দেয়। কিন্তু এই ভোট প্রচার শেষ হলে এই মানুষগুলো আর গুরুত্ব পায় না, এমনকি দেখা যায় নির্বাচনের দিনও রাজাসাহেব এইসমস্ত সাধারণ মানুষগুলিকে এড়িয়ে চলে। প্রসঙ্গত উল্লখযোগ্য –

"পরচার্‌ক লকি, বাবাজির স্নেহধন্য লকি একপাশে এঁটো শালপাতা হয়ে দাঁড়ায়।"[৬]

এই প্রতিচ্ছবি সর্বকালের। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের 'সিমপ্যাথি' নেওয়ার জন্য, বলা চলে বিপুল ভোট সংগ্রহের জন্য মিথ্যা প্রচার করা হয়। বাবাজির শরীর অসুস্থ এই নাকি বাবাজির শেষ 'চুনাও'। নির্বাচনের আগে এই মিথ্যা যেন রাজনৈতিক 'ট্রেন্ড' একথা বলা বাহুল্য। কিন্নর রায় একজন স্পষ্টবাদী কথাসাহিত্যিক। তিনি চোখে যা দেখেন, কোনো গাল-গল্প না মিশিয়ে তা-ই সাহিত্য আকারে প্রকাশ করেন। এমনকি সরাসরি ইন্দিরা গান্ধী-রাজীব গান্ধীর মতো রাজনৈতক ব্যক্তিবর্গের কথা বলতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নি। আমরা সকলেই জানি ভারতের অন্যতম প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী-র গুলি খেয়ে মারা যাওয়ার কথা। এপ্রসঙ্গে গল্পকার লিখেছেন –

"রাজীবজিও তাঁর মায়ের মৃত্যুকে লাগাতে চাইছেন নির্বাচনী নৌকার স্পিডবোট হিসাবে।"[৭]

আমরা দেখতে পাচ্ছি কালানুযায়ী কিন্নর রায়ের গল্পে উঠে এসেছে সমাজের প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মানুষরা কীভাবে রাজনীতির শিকার হয়েছে। এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ক্ষমতা পাওয়ার লোভ কীভাবে নেতৃবর্গকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে নীতিহীন করে তুলেছে।

সময়ের সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সমাজও একইভাবে বদলেছে। আজকের সমাজে জাতিগত বিদ্বেষের প্রবণতা আগের তুলনায় কিছুটা হলেও কমেছে কিন্তু বাকি সমস্যাগুলি একইভাবে বহাল থেকেছে। স্বাভাবিকভাবে কিন্নর রায়ের রচনায় উঠে এসেছে সেইসমস্ত বিষয়গুলি। বর্তমান সমাজে চোখে পড়ার মতো সমস্যা হল- বেকার সমস্যা ও হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ইত্যাদি। কাজের খোঁজে কীভাবে বাড়ির সন্তানরা বাইরে যাচ্ছে, কীভাবে ধর্মের গোঁড়ামি বর্তমান সমাজকে মানুষের কাছে মরুভূমি করে তুলছে তার প্রতিচ্ছবি আমরা পেয়েছি 'মরুমায়া' গল্পে। কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায়ের 'মরুমায়া' (২০০২) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মণিরুল ইসলাম। তার জীবনের বর্তমান পরিস্থিতি দিয়ে আলোচ্য গল্পের শুরু। মণিরুলের বয়স আশি বছর। সে শারীরিকভাবে অসুস্থ। এরকম পরিস্থিতিতে একজন মানুষের দেখাশোনার জন্য কাছের মানুষদের অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু মণিরুলের পাশে কেউ নেই। তার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দু'ছেলের এক ছেলে থাকে মুম্বাইতে আর এক ছেলে থাকে দিল্লিতে। এক মেয়ে তার বিয়ে হয়েছে মেটিয়াবুরাজে। তাই স্বাভাবিকভাবেই মণিরুল অত্যন্ত একা।

মণিরুল ১৯৪৬-এর তেভাগা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। এই আন্দোলনে গ্রামবাংলার পঞ্চাশ লক্ষ কৃষক নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে জাতিভেদ ভুলে দাঁড়িয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির এক পতাকার নীচে। আজ তা ইতিহাস হয়ে গেলেও জীবন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মণিরুলের মধ্যে সেই আদর্শ বহমান। মণিরুল একজন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও ধর্মের গোঁড়ামি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তার মধ্যে আমরা পেয়েছি এক মানবিক সত্তাকে। যে জীবনের জন্য লড়াই করে, ধর্মের জন্য নয়। তাই শাকুর যখন বলে –

"সব মুসলমানকে এক করতে হবে। বড় গোলমাল চারপাশে। ইসলাম খাতরে মে।"[৮]

তখন মণিরুল জবাব দেয় –

"না শাকুর ইসলাম খাতরায় নেই। খাতরায় রয়েছে মানুষ। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিপদে পড়েছে।"[৯]

মণিরুল একজন লেখক। তেভাগা আন্দোলনরত জীবন অভিজ্ঞতা এবং তৎকালীন পরিস্থিতির কথা সে তার বইয়ে লিখেছে। তাই বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ভিড় করে। এই অংশে মণিরুলের মুখ

থেকে শোনা যায় তেভাগা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রসঙ্গের পাশাপাশি গরুর সঙ্গে গ্রামে ফেরার ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার কথা। যা কোনো ইতিহাস বইয়ে পাওয়া যাবে না। গল্পাংশটি উল্লেখ করা হল –

> "হ্যাঁ, মাঠের ভেতর একা হাঁটছি। চারপাশে কিছুই দেখা যায় না। এত অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে ফোঁস করে পাশে একটা শব্দ। ভূতে বিশ্বাস তখনও ছিল না, একনও নেই। তবু খানিকটা চমকেই পাশে তাকিয়ে দেখি –
> কি দেখলেন?
> ...দেখলাম একটা বড়সড় গরু।
> . . .
> ...আসলে জমিদাররা ফর্টি সিক্সে প্রায়ই কৃষকের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি লুঠ করে নিয়ে যেত। তারই কোনো একটা পালিয়ে এসেছে জমিদারের আওতা থেকে। আমি তো অন্ধকারে বাঁচার রাস্তা পেয়ে গেলাম গরুটাকে পেয়ে।
> কি রকম? স্বাতীর গলায় বিশ্বাস।
> ওর পেছন পেছন চলতে লাগলাম। বুঝলাম, গেরস্থের গরু, মালিকের গোয়ালে ফিরছে।..."[১০]

গল্পে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ। তারই মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে গল্পকার মণিরুলের জীবনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মূল গল্পের সঙ্গে মরুভূমির কোনো যোগ নেই। তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি গল্পকার আলোচ্য গল্পের শিরোনাম দিয়েছেন 'মরুমায়া'। আসলে গল্পের প্রধান চরিত্র মণিরুল দিনের পর দিন যে কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করছে তা মরুভূমির মতো প্রতিকূল পরিবেশে থাকার সমান। পারিবারিক দিক থেকে মণিরুল অত্যন্ত একা হয়ে পড়েছে। তাই একটু যত্ন পাওয়ার আশায় সে স্মরণ করেছে তার মৃত স্ত্রীকে। সমাজের আর পাঁচজন মুসলমানের মতো সে জীবনকে দেখে না। তারা ভাবে ধর্মের কথা, মণিরুল ভাবে জীবনের কথা। তাই পাইপে চড়া ইঁদুরগুলি কী খাবে তা মণিরুলকে অত্যন্ত ভাবায়। আসলে এই আদর্শ সে পেয়েছে পার্টি থেকে, সে খুব কাছ থেকে দেখছে কীভাবে স্বার্থত্যাগী মানুষের দল সমাজকে বাঁচানোর জন্য লড়াইয়ের ঝাঁপিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছে। কিন্তু আজ সেই আদর্শ বিপন্ন। তার শারীরিক অসুস্থতার কথা এই সমাজ ভাবে না। রমজানে রোজা না করার জন্য তাকে নাস্তিক বলে দূরে সরিয়ে রাখে। সারাক্ষণ তাকে শুনতে হয় ধর্মের 'কচকচানি'। এমন পরিস্থিতি মণিরুলের কাছে এই সমাজ মরুভূমি হয়ে উঠেছে। তাই তার স্বপ্নে ভেসে ওঠে মরুভূমির বালিতে গলা অবধি ডুবে থাকা মানুষের প্রতিচ্ছবি।

লেখকের 'দলমত' (২০১৬) গল্পে উঠে এসেছে এক নির্মম প্রসঙ্গ। ক্ষমতায় আসীন হয়ে বিশেষ রাজনৈতিক দল কীভাবে হিংস্র হয়ে উঠছে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কথা বলে তাদেরকে ঘরছাড়া করেছে এই প্রসঙ্গগুলি উঠে এসেছে আলোচ্য গল্পে। সি.পি.আই (এম) পতনের পর কয়েক বছরের মধ্যেই 'গ্রামদখল'-এর যে লড়াই শুরু হয় তা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আনার বিবি ও তার বিতাড়িত দুই দেওরের কাহিনি দিয়ে। ময়ূরাক্ষী পাড়ে অবস্থিত আলিপুর, বেতল, বামাকাটা গ্রামগুলির উপর হওয়া দৈনন্দিন উৎপীড়নের কথা এই গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষমতায় আসীন হওয়া নেতৃবৃন্দ জোরপূর্বক দলগত করার জন্য আনার বিবির বর ও দেওরদের কাছে "আমি আর অন্য পার্টি করবো না"[১১] এমন 'দসখত' নেওয়ার মত কদর্য কাহিনি। শাসকদল এখানেই থামেনি, যারা দলবদল করেনি তাদের জলের কল মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। পোষ্য গরু, ছাগল সবকিছুই লুঠ করে নিয়ে গেছে। গ্রামের এমন সন্ত্রাসজনক পরিস্থিতিতে স্কুল সহ সকল সরকারি দপ্তর বন্ধ থাকে। তাই এক অভাবনীয় প্রভাব পড়ে গ্রামীণ শিক্ষাব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকায়। গল্পে দেখা যাচ্ছে, নানান সেলিব্রিটিসহ সরকার এই নিপীড়িত মানুষদের খারাপ সময়ে পাশে দাঁড়ানোর কথা বললেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

সাম্প্রতিক ঘটে যাওয়া আরো একটি প্রসঙ্গের কথা উঠে আসে গল্পকারের 'হাওয়া ফিস ফিস' (২০১৬) গল্পে। গল্পের বিষয়বস্তু হল- ভিনদেশে বেআইনিভাবে গোরু পাচার সহ অন্যান্য মালপত্র পাচার। গল্পের মূল চরিত্র খিজির সেখ

ওপার বাংলায় গোরু পাচার করে। শুধু গোরু পাচার নয়, পিস্তল, বারুদ, সোনার বিস্কুট ইত্যাদি বেআইনিভাবে পাচার করে। ফলত একদিকে যেমন জাল নোটে বাজার ছেয়ে যায়, অন্যদিকে জটাধর শাসমলের মতো কিছু মানুষ নিজেদের পকেট ভারি করে। বলা বাহুল্য এমন কুকর্মের পিছনে রাজনৈতিক নেতারাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এপ্রসঙ্গে লেখক বলেন–

> "দল বদলান-দল পালটান, নেতা কর্মীদের ক্যাডার কেনাতেও মোটা টাকার অনেকটা ব্যবহার করে থাকে জটাধর শাসমল, মণির শেখ।"[১২]

বলা যেতে পারে ২০১৬ সালে যে প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে লেখক গল্পটি রচনা করেছেন সেই সময় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দলবলের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এই প্রবণতা সর্বকালেই প্রাসঙ্গিক। আসলে স্বার্থন্বেষী কিছু মানুষ সাধারণ মানুষের ন্যায়ের কথা, সকলের জন্য সুবিধার কথা বললেও শুধুমাত্র নিজে সুবিধালাভের জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করে থাকে। গল্পে টাকা নিয়ে 'ঝাণ্ডা বদলানো'-র বিষয়টি মণির শেখ ও জটাধর শাসমল চরিত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক দলাদলিতে সমাজ সর্বদায় প্রভাবিত হয়। অশান্তিতে ভোগে সাধারণ কিছু মানুষ। এখানেও দেখা যায় রাজনৈতিক দলাদলি ও চোরাই কারবারে বলি হয়েছে খিজির ও ফজিরের মত সাধারণ মানুষেরা। আলোচ্য গল্পটিতে লেখক সমাজে দলীয় সুবিধাভোগী রাজনীতির বাস্তব দিকটিই তুলে ধরেছেন।

গল্পগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজনীতির কুপ্রভাব সমাজের অগ্রগতির পথকে প্রতিকূল করে তুলছে। তবে বাস্তবে যে রাজনীতি শুধুই কুপ্রভাব ফেলে এমন নয়, সরকার প্রতিনিয়তই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশের সাধারণ জনগণকে সুবিধা প্রদান করতে। চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে, রাস্তাঘাট সবকিছুতেই আগের তুলনায় অনেক উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু কিছু মধ্যসত্ত্বভোগী লোভী নেতাদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পসহ নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। সমাজে বিভিন্নভাবে আমরা দেখছি রাজনীতির নামে আদর্শহীনতার ছবি। মানুষ সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদের কথা ভাবতে ব্যস্ত। আজকের সমাজে দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে বাজারমূল্য বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব এই সমস্যাগুলি প্রভাব ফেলছে প্রত্যেকটি পরিবারে। মণিরুলের মতো শত-শত পিতা সন্তানদের থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কারণ সন্তানরা কর্মসংস্থানের খোঁজে নিজ বাসস্থান ছেড়ে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতির শিকার হয়ে। হারিয়ে যাচ্ছে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের টান। জীবন ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে চলেছে। এই সবকিছুর জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দায়ী বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যা সমাজের ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে। আর এই প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠে উঠেছে গল্পকার কিন্নর রায়ের গল্পে।

তথ্যসূত্র :

১. রায় কিন্নর, সেরা পঞ্চাশটি গল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৫৫৭
২. তদেব, পৃ. ৫৫৬
৩. তদেব
৪. তদেব
৫. তদেব, পৃ. ৫৫৮
৬. তদেব, পৃ. ৫৪০
৭. তদেব, পৃ. ৫৩৪
৮. তদেব, পৃ. ৩৫
৯. তদেব, পৃ. ৩৫
১০. তদেব, পৃ. ৩৩
১১. রায় কিন্নর, গল্পসল্প, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১৬১
১২. তদেব, পৃ. ২৬